২২/১০/২০০৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২২ ... কলাম ... ৪ ...

শহীদ জিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কি স্বপ্নই রয়ে যাবে?

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশ বছর

আমান উদ্দীন মুহাম্মদ মুজাহিদ

হাজারো বছরের ইতিহাসসমৃদ্ধ এবং দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী এদেশের তৌহিদী জনতার রক্তঝরা আন্দোলনের ফসল মুসলিম জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের স্পন্দন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রায় নামসর্বস্ব একটি আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে চলেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মনিরপেক্ষ ইসলাম বিদ্বেষী একটি বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রের শিকার। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন এক প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে বিগত আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিকত্ব ধ্বংসের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করে। বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার ইসলামী অস্তিত্ব নিয়ে নিভু নিভু অবস্থায় নতুন সম্ভাবনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ক্যাম্পাসে ইসলামপ্রিয় ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ এক নতুন কাণ্ডারীর জন্যে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন, যিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছাবেন। দুঃখজনক হলেও সত্য এ পর্যন্ত ছয় ছয় জন ভিসি, ই.বি.তে নিয়োগপ্রাপ্ত হন যাদের সবাই ছিলেন দলীয়ভিত্তিক এবং কেউই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে ক্যাম্পাসকে ঢেলে সাজাননি। উল্টো মৌলিকত্ব ধ্বংসের যাবতীয় আয়োজনসহ দুর্নীতি, দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি, অব্যাহত সন্ত্রাস, অবৈধ নিয়োগদান এবং সরকারী ছাত্র সংগঠনকে অবৈধ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে দারুণভাবে কলুষিত করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা ছিলো-

(ক) কলা ও বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সাথে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন।

(খ) নতুন আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যস্তকরণ।

(গ) ঐশিক ও জাগতিক জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে একটি সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জ্ঞানেরই বিস্তার এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন : ১৯৭৭ সালে ওআইসির উদ্যোগে পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর অনেক বাধা-বিপত্তি ও জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ওআইসির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার আশা ব্যক্ত করেছিলেন।

ঢাকা থেকে স্থানান্তর- ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা প্রণয়ন- ১৯৮৫/৮৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকার পার্শ্ববর্তী বোর্ডবাজারে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয় এবং সুন্দরভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম চলতে থাকে। কিন্তু তৎকালীন স্বৈরশাসক এরশাদ ইসলাম বিদ্বেষী একটি বিশেষ মহলের যোগসাজশে বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারী ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গায় স্থানান্তর করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিকত্ব ধ্বংসের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করেন। এদিকে স্বৈরশাসক এরশাদ ১৯৮৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর ডঃ এএনএম মমতাজ উদ্দীন চৌধুরীকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলামকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগদান করেন। প্রফেসর সিরাজ ভিসি নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পরপরই মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য বরাদ্দকৃত কোটা বাতিল, ছাত্রভর্তি, অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগদানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল-লক্ষ্যের বিপরীত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অন্যদিকে ক্যাম্পাসের ছাত্র-শিক্ষক দুর্নীতিবাজ ভিসি ডঃ সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে সীমাহীন, অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনে তার অপসারণের দাবীতে তীব্র আন্দোলন শুরু করায় তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার সিরাজ ভিসিকে অপসারণ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসর ডঃ আব্দুল হামিদকে ১৯৯১ সালের ১৭ জুন ভিসি হিসেবে নিয়োগদান করেন। প্রফেসর ডঃ আব্দুল হামিদ ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও নীতিবান ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গন্তব্যে পৌছানোর যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু সিরাজ ভিসির আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একটি অংশ তৎকালীন সরকারী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে উস্কে দিয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোসহ জোট বেঁধে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং কতিপয় নাস্তিক শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ক্যাম্পাসে প্রায় অর্ধকোটি টাকা মূল্যের সম্পদ ধ্বংস করে তাণ্ডব সৃষ্টি করে এবং এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, প্রফেসর ডঃ আব্দুল হামিদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান চারদলীয় জোট নেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আন্তরিক সদিচ্ছায় ২০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা বিভিন্ন বিভাগসমূহে বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কতিপয় বামপন্থী শিক্ষক কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার কারণেই সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। একপর্যায়ে প্রফেসর ডঃ আব্দুল হামিদ পদত্যাগ করে পত্র পেশ করেন। সরকার তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঃ ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডঃ ইনাম-উল-হককে ১৯৯৫ সালের ৮ মে ভিসি হিসেবে নিয়োগদান করেন। প্রফেসর ইনাম-উল-হক বিএনপি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৬ সালে ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার সাথে সাথে গায়ে মুজিব কোর্ট লাগিয়ে রাতারাতি মুজিব সৈনিক হয়ে যান, যা ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। তৎকালীন সরকারী ছাত্র সংগঠন মুজিববাদী ছাত্রলীগকে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাই ছিল ইনাম ভিসির একমাত্র কাজ। প্রফেসর ইনাম-উল-হক তার বিরুদ্ধে পরিচালিত (দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও সীমাহীন অবৈধ নিয়োগের বিরুদ্ধে ইসলামী ছাত্র শিবির কর্তৃক পরিচালিত) ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মদদদানের সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। ১৯৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ভিসি এনামের প্রত্যক্ষ মদদে মুজিববাদী ছাত্রলীগ পার্শ্ববর্তী এলাকার সর্বহারা সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়ে ক্যাম্পাস দখলের অভিপ্রায় হাজার হাজার রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে প্রায় দু'শতাধিক শিবির নেতা-কর্মীকে গুলীবিদ্ধ করে ও মেধাবী ছাত্র শিবির নেতা আমিনুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কিন্তু আওয়ামী জার্সি পরেও রেহাই পাননি প্রফেসর ইনাম-উল-হক। এদিকে তৎকালীন আওয়ামী সরকার ১৯৯৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের প্রফেসর বঙ্গবন্ধু পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ নেতা প্রফেসর কায়েস উদ্দীনকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দান করেন। প্রফেসর কায়েস উদ্দীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আওয়ামীকরণের যাবতীয় আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করেন। ইসলামী চরিত্র ধ্বংস ও ইসলামী বিষয় খোলার বিষয়ে বিরূপ মনোভাব পোষণসহ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রণয়নের চেষ্টাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিপরীত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রফেসর কায়েস উদ্দীন তার আমলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আওয়ামী ডিগ্রীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন শুধুমাত্র দলীয় পরিচয়ে। অপরদিকে ফ্যাকাল্টি প্রথম ও বিভাগীয় প্রথমসহ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ইসলাম পন্থী একাধিক ছাত্রকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না দিয়ে চরম ইসলামবিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ২০০০ সালের নভেম্বরে ক্যাম্পাসে ছাত্র- শ্রমিক সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি মারাত্মক অবনতি ঘটলে তৎকালীন আওয়ামী সরকার প্রফেসর কায়েস উদ্দীনকে অব্যাহতি দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর লুৎফর রহমানকে ভিসি হিসেবে নিয়োগদান করেন।

বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের কাছে ই.বি.কে নিয়ে জাতির প্রত্যাশা প্রতিষ্ঠার ২২ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজো পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছতে পারেনি। উপরন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির হিংস্র ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে। আমাদের দেশের বহু পরে প্রতিষ্ঠিত আজকের মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান পৃথিবীতে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে তার মূল লক্ষ্য পথ থেকে বিচ্যুত করার পেছনে যারা সবচেয়ে বেশী দায়ী তারা হলেন- অতীতের ভিসিগণ, যারা ক্যাম্পাসে দুর্নীতি, নিয়ম, অনিয়ম, দলীয়করণ করার পাশাপাশি সরকারী ছাত্র সংগঠনকে অবৈধ সুযোগ- সুবিধা দিয়ে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করতে চেয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিকত্বকে ধ্বংস করেছেন, তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে ৪ দলীয় জোট সরকারের কাছে ই.বি.র ক্যাম্পাস পরিবারসহ দেশের তৌহিদী জনতা নিম্নোক্ত দাবী করছে-

(১) একজন ইসলামী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপণ্ডিতকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগদান।

(২) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনরায় ঢাকা অথবা ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানান্তর।

(৩) ১৯৯৪ সালে প্রস্তাবিত এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অনুষদ খোলাসহ ফিকাহ বিভাগ, ইঃ অর্থনীতি, মুসলিম দর্শন, ইসলামী প্রশাসনসহ মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামী চিন্তাধারা সম্পন্ন বিষয়াদি চালু করে মুসলিম বিশ্বের উপযোগী ইসলামী চিন্তানায়ক উপহার দেয়া যারা সত্যিকার অর্থেই মুসলিম জাতির স্বরূপ উন্মোচন করতে পারবে।

(৪) ১৯৯৩ সালের প্রস্তাবিত (দেশনেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আন্তরিক সদিচ্ছায় যা প্রস্তাবিত ছিল) প্রত্যেক বিভাগে ২০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(৫) ইসলামী পরিবেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চেতনা পরিপন্থী সকল কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ।

(৬) ছাত্র রাজনীতিই বর্তমান সন্ত্রাসের মূল কারণ। তাই অর্ডিনেন্সে যেহেতু ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রয়েছে পূর্বের মত বর্তমানেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ।

(৭) অপরাপর আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময় চুক্তিকরণ ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা নিশ্চিতকরণ। সর্বোপরি-

(৮) বিদেশী শিক্ষক নিয়োগসহ মালয়েশীয় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢেলে সাজানো।

উপসংহারে বলতে চাই- আমাদের এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের তৌহিদী জনতার হৃদয়ে লালিত এক চরম ও পরমাকাঙ্ক্ষিত বস্তু। আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন, গর্বের উৎস, হৃদয়ের একান্ত আবেগ-ভালোবাসা। প্রতিষ্ঠার ২২ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজো পর্যন্ত নামের স্বার্থকতা রচিত হয়নি। উল্টো ইসলাম বিদ্বেষী মহলের দাপটে সদা-তটস্থ ইসলামপ্রিয় ছাত্র-শিক্ষকসহ পুরো ক্যাম্পাস পরিবার। এ থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় বর্তমানে উন্মুখ হয়ে আছেন ক্যাম্পাস পরিবারের সবাই। সবার প্রত্যাশা একটাই- আমরা এমন একজন ভিসি চাই, যার নেতৃত্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে তার মৌলিকত্বের দিকে। দীর্ঘ ২২ বছরের বন্ধাত্ব ঘুচিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে ফিরে আসবে। আধুনিক মালয়েশীয় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম জাতির অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, একটি সুখী ও স্বপ্নময় সমাজ বিনির্মাণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় খালিদ, তারিক ও মুসার মত দিকবিজয়ী একদল শক্তিশালী সুশৃংখল শিক্ষিত যুবক তৈরী করবে- এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।